IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

The Crisis Of Women Life And Barren Time In The Story Of Selina Hossain: In The Mirror Of Thought

Rami Chakraborty
Associate Professor
Bengali Department, Assam University, Silchar

Abstract

Selina Hossain is a prominent writer of Bengali literature who writes short stories, novel, children's literature etc. she has been writing since seventies. In her writings, the partition of the country, refuse problem, enclaves, the life struggle of working people, the crisis of women's existence etc. have come up. Few stories of Selina Hossain have been selected for this discussion, A speciality of her women centered writing is that female characters are strong in self-empowerment and struggle to sustain their existence.

Key Words

Narrative, Barren time, Patriarchy, Women's position, Empowerment, Oppression

সেলিনা হোসেনের গল্পে নারী জীবনের সংকট এবং বিপন্ন সময় : ভাবনার দর্পণে

রামী চক্রবর্তী
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্য তথা ভৌগোলিক অর্থে বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতনামা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। সত্তরের দশক থেকে তাঁর লেখালেখির পূর্ণমাত্রার সূচনা। ছোট গল্প, উপন্যাস, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। দেশভাগ, উদ্বাস্তু-সমস্যা, শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম, নর-নারীর সম্পর্ক বিন্যাস, নারীর অস্তিত্ব সংকট ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। এই আলোচনার জন্য সেলিনা হোসেনের তিনটে গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। শুধুমাত্র একটি গল্প ছাড়া বাকি দুটো গল্পে নারীর জীবন কেন্দ্রিক নানা প্রশ্ন-সমস্যা-উত্তরণের সম্ভাব্য প্রয়াস আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় গল্পে বিপন্ন সময়ের কথকতা বিবৃত হয়েছে। তাঁর নারী-কেন্দ্রিক লেখার বিশেষত্ব এখানেই যে হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁর নির্মিত নারী চরিত্রগুলি আত্মশক্তিতে দৃঢ় এবং অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম করে।

বীজশব্দ

আখ্যান, বিপন্ন সময়, পিতৃতন্ত্র, নারীর অবস্থান, ক্ষমতায়ন, অবদমন

বিশ্লেষণ

> "আমার লেখালেখির সূত্র আমার অভিজ্ঞতা। জীবনের নানা গল্পই নানা মাত্রায় সাহিত্যে উঠে এসেছে।" [১]

এই উচ্চারণ স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের। ১৯৪৭-এ রাজশাহীতে জন্ম। বগুড়ার করতোয়া নদীর তীর ঘেঁষে স্মৃতির সঞ্চয় নিয়ে শৈশব-কৈশোরের প্রহর পেরিয়ে যৌবনে প্রবেশ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে কর্মজীবনের শুরু বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে ১৯৭০-এ। ১৯৯৭-এ সেখানকার প্রথম মহিলা পরিচালক হিসেবে স্বীকৃতি পান। ২০০৪-এ কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থের প্রকাশনা, তাছাড়া কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে 'শালিকের দেশ' পত্রিকাটির সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। চল্লিশটিরও বেশি উপন্যাস, পনেরোটিরও অধিক গল্পগ্রন্থ, প্রবন্ধ, শিশু-কিশোর সাহিত্যের রচয়িতা তিনি। এছাড়াও নানা গ্রন্থের সম্পাদনার কাজেও তাঁর পরিচয় মেলে। অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত সেলিনা বিশ্বাস করেন -

> "শিল্পের সত্যকে সমুন্নত রেখে জীবনের সবটুকু গল্প বলাই লেখকের দায়বদ্ধতা।" [২]

লেখকের এই কথার সূত্র ধরেই আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনার দিকে এগোতে চাই। জীবনের সবটুকু বলতে গিয়েই তাঁর লেখালেখির একটি বিরাট অংশ জুড়ে বিভিন্ন বর্গের নারীর ঘর-গেরস্থালির কথকতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। স্বল্প পরিসরের এই প্রবন্ধের জন্য তাঁর কয়েকটি গল্পকে বেছে নেওয়া হয়েছে। গল্পগুলো হল 'মইরম জানেনা ধর্ষণ কী', 'পারুলের মা হওয়া' এবং অন্যটি 'থুতু'। প্রথম গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে একটি নারীর গল্প-কথা। যাদের শিক্ষা নেই, জীবিকার সন্ধান নেই, যারা প্রতিরাতে প্রয়োজনের নিক্তি মেপে হাতবদল হয়। আর আসল কথা হচ্ছে যাদের কাছে নিজেদের ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষার কোনও মূল্য নেই। আর তাই অন্যের কাছেও তার মূল্যায়ন হয় না। নারীর জাগরণের কথা বলতে গিয়ে সেলিনা হোসেন একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন -

> "নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমার প্রথম চিন্তাটি হলো নারীকে নিজের শক্তিতে তৈরি হতে হবে।" [৩]

গভীর থেকে নারী-জীবনের উপলব্ধিকে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক লিঙ্গ-সাম্যে নয় মানুষের অধিকারে পরিচিতি দানকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন। 'মইরম জানেনা ধর্ষণ কী' গল্প পাঠের প্রতিক্রিয়ায় যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল মইরম মানে একটি নারীর কাছে ধর্ষণের স্বরূপ অজ্ঞাত কেন? তাহলে উত্তরটি কী এভাবে খুঁজবো একজন নারীর কাছে তার ইচ্ছা এবং প্রয়োজনের স্বরূপটি স্পষ্ট থাকলে তবেই সে সম্মতিতে সহবাস এবং বিরোধিতায় ধর্ষণের অর্থটি বুঝতে পারে। কেননা নারীচেতনাবাদের নিরিখে Desire বা ইচ্ছা এবং Need বা প্রয়োজন শব্দদুটির আভিধানিক মানে যথাক্রমে দাঁড়ায় -

> "An essential need whose social construction is sexuality … Need changes to demand ... Desire is therefore always the question of significant interrelationship …"

- মানে প্রয়োজন কখনো দাবি পূরণের শর্ত হয়ে ওঠে, পক্ষান্তরে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের মধ্যে থাকে একটি পারস্পরিকতার বোধ যেখানে উপলব্ধির পূর্ণতা কাজ করে। তবে এই ভালোলাগা বোধের অভাব বা শূন্যতায় কিন্তু একের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয়, অন্যজনের ভূমিকা থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষের সক্রিয় ভূমিকা থাকে আর নারী থাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কেননা আকাঙ্ক্ষার দ্বৈত উপস্থিতির ক্রিয়াশীলতার অভাবে এসব ক্ষেত্রে নারী শুধু যৌনতার মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হয় কেননা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিই সম্পন্ন হয় কখনো তার অসম্মতিতে আবার কখনো বা নিজে সক্রিয় হয়ে ওঠার আগেই। এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক একটি মন্তব্যের অবতারণা করতে চাইছি –

> "যৌনতা মূলত জৈবিক প্রকরণ নিশ্চয়,কিন্তু এও সমান সত্য যে তা যুগপৎ মনস্তাত্ত্বিক সংস্থানও বটে। যতখানি পুরুষের, ততখানি নারীর।" [৪]

এ গল্পটিতে পিছিয়ে পড়া বর্গের নারী হিসেবেই দেখানো হয়েছে মইরম, তার মা সখিনাকে। আর রয়েছে অজ্ঞাতকুলশীল জসিম,উ যার সঙ্গে মইরমের বিবাহপূর্ব সম্পর্কেও মা সখিনার অসম্মতি থাকেনা সুরক্ষিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সমাজে জসিমের পরিচয় 'জাউরা পোলা' বা জারজ সন্তান হিসেবে অর্থাৎ এর নিজের পরিবারের কোন ঠিকানা নেই। সে ভবিষ্যতে তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহের সুবাদে আশ্রিত হতে পারে এভাবেই ভবিষ্যতের অংক কষে নিয়েছে সখিনা। তাহলে মইরমকে ঘিরে সকলের স্বপ্ন গড়ে উঠেছে। মইরমের কাছে জসিম শরীরের সুখ চায় অবশ্য বিয়ের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। নূরালীর প্রয়োজন মইরম যেন তাকে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুখ দেখায় এক টুকরো জমির বিনিময়ে। মা হয়ে সখিনার দাবি একটি পরিপূর্ণ সংসারের যেখানে সে-ই কর্ত্রীর ভূমিকায় থাকবে। কিন্তু এতো কিছুর মধ্যে মইরমের ইচ্ছার প্রশ্নটিই চিরতরে হারিয়ে যায়। সেলিনা মইরমের মধ্য দিয়ে নিরক্ষর নারীর ত্রিমুখী অবনমনের চিত্রটি তুলে ধরেন। গল্পের সাবলীল কথনভঙ্গিতে সখিনার সংলাপে জীবনের হিসেবের এই চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

> "সখিনা কড়া কথা বলে, চুপ। ধান ভানা শেষ কর।
>
> ধান ভানলে চাল হবে। কুঁড়া হবে। চাল গিলবে নূরালী। কুঁড়া গিলবি তুই।
>
> আর জসীম কী গিলবে? ... সখিনা ওর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে, জসিম গিলবে ধান আর কুঁড়া সব।
>
> আপনি কী গিলবেন আম্মা?
>
> আমার দুইন্যা আরো বড়। সেইখানে আমার মাইয়া আছে, মাইয়ার জমি আছে, ঘরের ভিটি, চুলা, খড়ি, ঘরের পেছনের কলাগাছ,কবুতর..." [৫]

মইরমের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দুটি পুরুষের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জসিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোলাগার মুহূর্তে পৌঁছোতে পারতো কিন্তু এখানেও মইরমের নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা রূপই আমরা দেখতে পেলাম -

> "জসিম যেদিন ওকে ঢেঁকিঘরে কাজটা করল তখনই ওর মনে হয়েছিল, মরণ!
>
> ভালবাসার রেশ জেগে ওঠার আগেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যায়। ও তেমন করে কিছু উপভোগ করে না। বরং ওর ভেতরে ক্রোধ জন্মায়। শুধু বুঝতে পারে জসিম ওকে জোর করেছে, তা জোর তো ও করতেই পারে, জসিম যে ওকে ভালবাসে, নিজেকে এভাবে সান্ত্বনা দেয় ও। ...

> ধৃত এটা কী ভালবাসা! ভালবাসা বোঝার আগেই ভালবাসার ব্যাপারটি কেমন যেন হয়ে গেল। কী হয়ে গেল এর কোনও ব্যাখ্যা মইরম আর করতে পারে না।" [৬]

বিমূর্ত রোম্যান্টিকতার শিহরণ বিহীন যৌনতার সম্পর্ক একটি নারীর কাছে শুধুমাত্র জৈবিক অভ্যাসের মলিনতায় ধরা পড়ে কিন্তু সংরাগের তীব্রতায় প্রেমের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে রাখে না। তাই মইরম এখানে কার্যত সম্মতির অমর্যাদায় ধর্ষিতা হয়। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা-সম্পর্কের জটিল অন্তর্বয়নের চোরাবালিতে এই সত্যটুকু উচ্চারিত হয় না। ভেসে যাওয়া তরীর দুর্বল পালের মতো মইরমের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনে জেগে থাকে জসিমের তাকে দেওয়া বিয়ের প্রতিশ্রুতিটুকু। মইরম দ্বিতীয়বার ধর্ষিতা হয় স্থায়ী আস্থানা গড়তে যে জমিটুকুর প্রয়োজন তার বিনিময়ে। নূরালী জমির বিনিময়ে মইরমের কাছে সন্তান দাবি করে। জসিম এবং সখিনারও তাতে পূর্ণ সমর্থন থাকে। আবার জসিমও পুরুষ হওয়ার অলিখিত অধিকারে অবলীলায় খোলা ময়দানে মইরমের নারীত্বকে পণ্য করে সবার কাছে তার মাতৃত্বের খবর রটিয়ে দিয়ে। যদিও কেউ সেটা বিশ্বাস করে না এবং সন্দেহের আঙুল তার দিকেই ঘুরে আসে। এভাবেই জসিমের পৌরুষত্বের অহংকার এবং নারীর উপর কর্তৃত্বের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। মইরমের জীবনকে কেন্দ্র করে যে দুটি পুরুষের উপস্থিতি, দুই ক্ষেত্রেই মইরম অন্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। হয়তো এতে পরোক্ষভাবে তার নিজেরও কিছুটা প্রয়োজন মিশে ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি নারীকে সবসময়ই তার শরীর, তার নারীত্ব ইত্যাদির অনিচ্ছুক বিনিময়ের দায় মেটাতে হয়। সেখানে সে নিরুপায়। তাইতো -

> "যেদিন নূরালীর সঙ্গে ঘটনাটি ঘটল সেদিন বুক ভেঙে গেল মইরমের। ... তারপর উত্তেজিত বুড়ো হাড় সর্বস্ব শরীরে ওকে যখন মন্থন করল, ও চেঁচিয়ে বলল, মরণ!" [৭]

'মরণ' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মইরমের কাছে দুটি পুরুষই সমান্তরাল তাৎপর্যে উঠে এলো যেন অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন সম্পর্কের প্রেক্ষিতে। নূরালীর অট্টহাসি শুনে -

> "মইরম বুঝে যায় এটা জসিমের হাসি-হুবহু একই রকম-নূরালীর সঙ্গে জসিমের কোনও পার্থক্য নেই। ও নিস্তেজ হয়ে যায়।" [৮]

মইরম জানে না ধর্ষণ কী! মইরম এটাও জানে না কতটা সীমা অতিক্রান্ত হলে যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ বলা যায়! মইরমের কাছে দুটো সম্পর্কই অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও অপরিহার্য সামাজিক প্রেক্ষাপটে লৈঙ্গিক নির্মাণে। নূরালীর সংলাপে সেলিনা নারীর বিকল্পহীন নির্যাতন এবং অবদমনের ভাষ্য রচনা করেন -

> "মরণ শব্দ শুনে নূরালীর থুতু, মুখ থেকে ফসফস শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকে-মরণ তো জমি, ভিটা, ঘুঘু, লাউগাছ। মরণ তো চুলা, ভাতের হাঁড়ি, সানকি,নুনের বাটি। মরণ তো, শীত বৃষ্টি, রাইতে জোয়ান স্বামীর চোদন! মরণ তো মরণ ঘরের মধ্যে পস্ সব, পোলার কান্দন। হা হা করে হাসতে থাকে নূরালী।" [৯]

এখানে গল্পকার 'ধর্ষণ' শব্দটি উহ্য রেখে সেই অনুচ্চারিত প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার পটভূমি নির্মাণ করে চলেন মইরমের জীবন বৃত্তান্ত ঘিরে। যেখানে নারীবীক্ষার আলোকে পাঠকৃতিতে তাৎপর্যের এবং ভাষার পুনঃপ্রসঙ্গায়ন ঘটে।

নারী জীবনের আরেকটি সত্য, অভিপ্রেত দিক তার মাতৃত্ব। এই মাতৃত্বের নানা দিক নানা জনের গল্পে উঠে এসেছে। বিশেষ করে সেলিনা হোসেনের গল্পে সবস্তরের নারীর ছবিই উঠে এসেছে।ব্যক্তিগত মানেই রাজনৈতিক - এই ভাবনায় বিচার করলে প্রতিটি নারীর জীবনকে প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। কখনো ব্যক্তিপুরুষের তো কখনো রাষ্ট্রশক্তির অনুশাসনের শৃঙ্খলে নারীর জীবন নানাভাবে অধীনতার শিকার হয়। পিতৃতন্ত্র কৌশলে কখনো এটাতে নিরাপত্তার লেভেল সেঁটে দেয় তা কখনো নারীর নিষ্ক্রিয়তার কারণ হিসেবে

দেখাতে চায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর চারপাশে এমন ভাবে শিকল টেনে দেয় যে তা তার পারিবারিক সামাজিক এক্তিয়ার পেরিয়ে মনের উপর হুকুম তালিম করে। তাই পুরুষের বশ্যতা মেনে নিয়েই চলতে থাকে তার জীবনের ধারাপাত। তাদের জীবনেও ঋতু বদলের মতো যৌবন আসে, পুরুষের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে, মাতৃত্বের সঞ্চার ঘটে। এভাবে অভ্যস্ত জীবনে চলতে চলতে কখনো কখনো তাদের জীবনেও ছন্দপতন ঘটে। ভরসাস্থল পুরুষটি হয়তো জীবিকার উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে চলে যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনও তার প্রাণ কেড়ে নেয়, কখনও বা সে নিজেই জীবনে সুখের অন্য মুহূর্ত খুঁজে নেয়।কিন্তু তখনও সেই সর্বহারা নারীর জীবনটি কিন্তু চলতেই থাকে। সেলিনার লেখায় এমন নারীর সংখ্যা কম নয়। শুধু তাদের বিশেষত্ব এখানেই প্রয়োজন-চাহিদা- আকাঙ্ক্ষার মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্য যে জৈবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্তরান্তর ঘটায়, সেই পোড়ো - শক্ত জমির উপরে সেলিনা তাঁর মেয়েদের দাঁড় করিয়ে দেন। তাই তাঁর লেখায় মেয়েরা সঠিক হাল ধরে নৌকো বেয়ে যায় হাওয়ার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে খুব সুনিবিড় সখ্যতা রেখেই। যে মাটিতে তাদের জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা, সেই মাটিতেই জীবনে রুখে দাঁড়াবার অস্ত্র গড়ে দেন তিনি। অনেকের হয়তো মনে হতেই পারে তাঁর গল্পের বাস্তব আর বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের সমাজ বাস্তব - এই দুই বাস্তবে কি মিল আছে! এ তো গল্পকারের কল্পিত বাস্তব। কিন্তু এটাও আমাদের ভুললে চলবে না যে তারও আগে দেশভাগের দ্বিখণ্ডিত জমিতে দাঁড়িয়েই আবু ইসহাকের "সূর্য দীঘল বাড়ী"-র জয়গুন প্রবল ঘৃণায় নিশ্চিত পরাধীন আশ্রয়ের চেয়েও অনিশ্চিত স্বাধীন জীবনকে প্রত্যাশিত ভেবে ভিটে ছাড়ে। আর সেলিনা যখন লিখছেন তখন সময় এবং পরিসর দুটোই অনেকটা পরিবর্তিত। তাই এক নারীর পক্ষে কঠোর বাস্তবকে মেনে নিয়ে জীবন সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকাটা খুব স্বাভাবিক। আর সেলিনা তো বিশ্বাস করেন...

> “নারী আমার কাছে শুধু প্রাকৃতিক লিঙ্গ নয় নারী মানুষ। মানুষের মানবাধিকারের সত্যের সঙ্গে নারীর সামাজিক অবস্থান আমার কাছে বৃহত্তর সত্য। এখানে নারী পুরুষের পার্থক্য নেই। নারী পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য আছে কিন্তু সামাজিক অবস্থানের কোন পার্থক্য নেই। এভাবেই সাহিত্যে নারীকে দেখি। ... আমার উপন্যাসে প্রধান চরিত্র নারী এসব নারীদের বেশিরভাগ সাহসী সংগ্রামী লড়াইয়ের জায়গাটা নিজেদের সচেতন বুদ্ধিমত্তায় বোঝে।” [১০]

এই বুদ্ধিমত্তাটুকুই তাদের ‘বিশেষ’ করে তোলে। এই বিশেষত্বকে আমরা তাঁর নানা লেখায় নারী চরিত্রগুলোতে দেখতে পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে এরকম আরও একটি গল্পের উল্লেখ করতে চাইছি। ‘পারুলের মা হওয়া’-গল্পটির নামের মধ্যেই বিশেষত্বের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। যে কোনও নারীর জীবনে মাতৃত্বের অনুভব সে তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতিটি নারী তার জীবনের অন্যতম স্বীকৃতি হিসেবেই এর মূল্যায়ন করে। কিন্তু এই স্বীকৃত ব্যাপারটিই সামাজিক রীতির অনুশাসনে অবৈধ বলে নিন্দিত হয়, যখন তাতে সমাজ অনুমোদিত কোনও পুরুষের নাম জুড়ে থাকেনা, তা সেই পুরুষটি যতই দায়িত্বহীন হোক না কেন। পারুলের মা হওয়ার পেছনেও এরকম একটি অতীত লুকিয়েছিল।

> “পারুল হিসেব করে দেখলো মাস ছ’য়েক আগে লোকটা উধাও হয়ে গেছে। ... কিন্তু লোকটা না বলে কয়ে চলে গেল কেন ? বলে গেলে কি ও বাধা দিত ? নাকি কাঁদতে বসত ? না, কোন কিছুই ও করত না, যে যেতে চায়, তাকে ও যেতেই দিত, বুকের ভিতর কোন ব্যথা হলে সেটা ওর নিজের জন্যই থাকত। ... ” [১১]

তবুও পারুলের চারদিকে হাজার প্রশ্নের ভিড়, যে প্রশ্নগুলো শুধু পারুলের নয়। বহুবছরের বহু স্বামী পরিত্যক্তা নারীর প্রশ্ন। যে নারী শরীরে মনে সম্পূর্ণা হয়েও যে কোনও মুহূর্তে স্বামী নামক পুরুষটির বিরাগের শিকার হতে পারে। এতটাই তুচ্ছ তার জীবন, এতটাই দুর্বল তার অবস্থান, যে তার জীবনের ভরকেন্দ্রটি যে কোনও মুহূর্তে শূন্য হয়ে যেতে পারে। হাজার বছর ধরে মেয়েরা এই পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে নিয়তিকে সমর্পণ করে বাঁচতে শিখেছে।

সে জেনে এসেছে বদ্ধভূমিতে সমর্পিত জীবের কণ্ঠরুদ্ধ থাকে, তাই এতদিন তার কণ্ঠরুদ্ধ ছিল। নিঃস্বর ছিল সে। কোনদিনই পিতৃতন্ত্র নারীকে কথা বলার সে সুযোগ দিতে চায়নি কেননা তার সর্বশ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে নারী মুখ খুললে। তাইতো ডেল স্পেন্ডার এর ভাষায়,

> "When a society is structured so that it permits male primacy and produces male dominance, it is quite reasonable to classify women talk as dangerous because the whole fabric of the social structure could be undermined if the expression of the subordinates were allowed free voice" [১২]

কিন্তু তারপরও কোনও পরিস্থিতিই এক রকম থাকে না। কোন না কোন দিন নিষেধের অচনায়তন ভেঙে পড়ে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে। সেই কণ্ঠরুদ্ধ অবলা জীবটিও তার কন্ঠ তুলে ধরতে চেষ্টা করে। অন্যের আরোপিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে না নিয়ে নিজের অবস্থানকে বুঝতে শেখে। এ গল্পে পারুলেরও তাই মনে হয়,

> "ওর শূন্য করোটি বলে, কখনো তো হা-অন্ন হা-অন্ন ধ্বনিত হয়নি সংসারের দিগন্ত রেখা পর্যন্ত। কাম-ইচ্ছা ও তো কখনও মুখ থুবড়ে পড়ে নি রংধনুস্পর্শী প্রান্তর জুড়ে। তবে কেন ও চলে গেল? ... কেবলই মনে হতে থাকে ওর করোটি শূন্য হয়ে যায় এই ভেবে যে লোকটি কোনও কারণ ছাড়া ওর নারীসত্তাকে উপেক্ষা করেছে।" [১৩]

এভাবেই তো নারীকে যুগের পর যুগ ধরে প্রতিপ্রশ্নের কোন সুযোগ না দিয়েই বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু সেলিনার লেখায় আমরা দেখি নিরক্ষর নারীও তার অবস্থানকে বুঝে নিয়ে প্রশ্ন করে। সে নিজেকে গৃহপালিত জীব না ভেবে মানুষ ভেবেই লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য, সসম্মানে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এখানেই মেয়েদের রূপকথার প্রচলিত চরিত্রের ভূমিকার বদল ঘটে তাঁর লেখায়। তাঁর লেখায় রাজকন্যারা উদ্ধারের জন্য কোনও অজ্ঞাত রাজপুত্রের আশায় বসে না থেকে নিজেরাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, পরিবর্তনের পথ খুঁজে নেয়। এই পরিবর্তনের ভাষাকেই রূপ দেন সেলিনা তাঁর গল্পের নারী চরিত্রে। এড্রিএন রিচ বলেছিলেন,

> "In a world where language and naming are power, ...silence is oppression, is violence." [১৪]

তাই পারুল নির্ভয়ে নিজের মাতৃত্বের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু সে কাউকে পিতৃত্বের অধিকার দিতে অস্বীকার করে। তার মনে হয়,

> "পুরুষ মানুষগুলো পিতৃত্বের কর্তৃত্ব চায়। আর কিছু না সন্তানকে লালন-পালন নয় - ওকে নিজের কাছেও নেবে না - প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে স্বীকারও করবে না, শুধু জেনে আনন্দ পেতে চায় যে পারুলের গর্ভে তারই সন্তান।" [১৫]

পুরুষের এই পিতৃত্বের অহংবোধই খান খান হয়ে যায় যখন একজন নারী তার মাতৃত্বের অনুভূতিকে কোনও নাম দিতে অস্বীকার করে। সেলিনার গল্পে লিঙ্গ- রাজনীতির প্রেক্ষিতে নারীর 'শরীর' তার আপন নিজস্ব সত্তা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে, এতদিন যা পুরুষের ভোগের বস্তু ছিল। সেলিনা হোসেনের গল্পে এভাবেই পিতৃতন্ত্রের পরিচিত ছক ভেঙে যায়। নারীরা বিপন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত অপরাজিতই থেকে যায় তাদের আত্মশক্তির দৃঢ়তার কারণে। নারী তার আপন শক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে ।

পরবর্তী গল্প 'থুতু'। এই গল্পের আলোচনায় যাবার আগে ভূমিকার মতো করেই দু'চারটে কথা বলে নেওয়া যায়। জীবন-সত্য এবং সমাজ-সত্যের প্রকাশের দর্পণ হিসেবে ছোটগল্প যোগ্য আধার হয়ে ওঠে বক্তব্যের নিবিড়তা এবং একমুখীনতায়। এটাতো সাহিত্যের যে কোনও পর্বেরই মূলকথা হতে পারে, হয়ত এটাই সত্য। কিন্তু যেখানে

একটি ছোটগল্প আলোচনার বিষয় সেখানে পরিসর এবং সীমিত চরিত্রের উপস্থিতির বিন্যাসে গোটা মানবজীবনের কোনও একটি বিশেষ দিকের উপর আলো ফেলতে চায় তা, বিশেষ বোধের প্রকাশ ঘটাতে চায়। তাই ছোটগল্পের ক্ষেত্রে জীবন এবং সমাজগত সত্য যে বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল তার সঠিক বিশ্লেষণে আখ্যানের মূল্যায়ন সার্থক হয়ে ওঠে। 'থুতু' গল্পটির আখ্যানবস্তু যদিও মিজানের দৃষ্টিভঙ্গিতে উঠে এসেছে কিন্তু আখ্যানের অন্তর্নিহিত বয়ান আমাদের জানায় এটা আসলে মিজানদের গল্প। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রিধারী বেকার যুবক, ভোগ্য- পণ্যের জগতে বুঁদ হয়ে থাকা এই সমাজের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তাদের স্নেহ বঞ্চিত সন্তানের গল্প। মিজান চরিত্রটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে গল্পকার আসলে অবক্ষয়ী আধুনিকতার প্রেক্ষিতে এমন এক সমাজের বন্ধ্যা দশা চিত্রিত করেন যেখানে স্নেহ-মমতা মূল্যবোধ সব পণ্যায়িত হয় বাজার-মূল্যে। রাষ্ট্র যেখানে উত্তর-প্রজন্মের স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ কারিগর, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মূল্য ধার্য হয় ক্ষমতার বিজ্ঞাপনে। এই স্বপ্নহীন পোড়ো জমিতে শুধু নিরালম্ব শেকড়হীন মানবতার পচন দীর্ঘায়ত হয় আর মিজানের মতো উত্তর প্রজন্মের ব্যর্থতা আত্মগ্লানিতে আত্মিক সংকটের রিক্ততা তৈরি হয়। মিজানরা নির্গমহীন এই চক্রব্যূহের মধ্যেই আত্মপ্রতারণার মিথ্যে বেসাতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভূখণ্ডের ক্রমবর্দ্ধমান অবক্ষয়কে তুলে ধরতে সেলিনা হোসেন তির্যক বাস্তবতায় আখ্যানের বয়ান নির্মাণ করেন। যেখানে জীবন ও সমাজসত্যের চলমান রূপটি সরাসরি উঠে আসে না বরং

> "এই বাহ্য বাস্তবতার মতো উপস্থাপিত না-করে দৈনন্দিনতার ভিতরতন্ত্রীকে কিংবা উপরিতলে বর্তমান সত্য-সন্দর্ভকে তির্যক ও বাঁকা ভাবে, শ্লেষে-বক্রোক্তিতে, ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে, হাস্যে-কৌতুকে সাহিত্যে পরিবেশন করা হয়।" [১৬]

মিজানের মতো একটি উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের ভাবনার সূত্র ধরে আমরা ঘুণে ধরা সমাজের প্রতিচ্ছবিকে প্রত্যক্ষ করি। সেই সঙ্গে লক্ষ করি ক্ষয়-স্খলন-আত্মদ্রোহ-অবসাদের সংক্রমণে আক্রান্ত উত্তর-প্রজন্মকে। মিজানের ইচ্ছে করে শূন্য আকাশের নীলিমাকে স্পর্শ করতে কিন্তু নীচে তাকালেই এই বিবর্ণ শহর তার রাশিকৃত জঞ্জাল নিয়ে গ্রাস করতে আসে। জীবিকার সন্ধানবিহীন, অর্থহীন শিক্ষাব্যবস্থার পণ্যসর্বস্বতায় মিজানের মনে হয়েছে –

> "ডিগ্রিটা ওর কোনও কাজেই আসছে না। একটা অর্থহীন লেজ নামের পেছনে যুক্ত করার অধিকার পেয়েছে মাত্র। ওর মনে হয় ডিগ্রি দিয়ে না নিজেকে শিক্ষিত করতে পেরেছে না কোনও যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। যোগ্যতাই যদি অর্জিত হয় তবে সব জায়গা এমন অপাঙ্‌তেয় হয়ে যাচ্ছে কেন?" [১৭]

আখ্যানে বর্ণিত সামাজিক অবক্ষয় এবং সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের উৎকেন্দ্রিকতার সম্মিলিত ক্রিয়াশীল রূপই সময়-সমাজের চলমানতাকে তির্যকতায় তুলে ধরে। মিজান বাঁচতে চায় আকাশের নীলিমায় - মানবতার মহিমায়। এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এই জীবনানন্দীয় উচ্চারণ, 'প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ করে এক তিল বেশি / চেতনার আভা নিয়ে তবু / খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশ, / নির্দেশী' (অন্ধকার থেকে, জীবনানন্দ দাশ)

মিজানের চারদিকে বন্দিত্বের বলয় তৈরি হয়েছে, অসহায় মানবাত্মা তা থেকে মুক্তির পথ খোঁজে। কিন্তু পৃথিবীর গভীরতর অসুখের সময় মিজানের এই মুক্তিকামী মন চারপাশের বিষময় কোলাহলে 'একসেন্ট্রিক' বলে বিদ্রূপের ভাগিদার হয়। এভাবেই গল্পকার সময়ের বিকারকে, ব্যাধিগ্রস্ত সমাজকে এবং মানবতার শৃঙ্খলিত রূপকে তুলে ধরেন পরাভাষার আদলে -

> "ঘরে ঢুকে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে থাকে। ধবধবে সাদা বিছানার চাদর, ওর পর্দাগুলো সাদা, দেয়ালের রং সাদা। এত কিছু সাদার মধ্যে নিজেকে দেবদূত ভাবতে বেশ আনন্দ পায় ও। ... ঘরের ছাদে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। একটা বিশাল মাকড়সা বুকের মধ্যে সাদা রঙের ডিমের খোলস নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। দেয়ালে ছড়িয়ে যাচ্ছে হাজার মাকড়সা। ... ও দুইহাতে মুখ ঢাকে। যেন ওর শরীর দিয়ে উঠে আসছে মাকড়সার বাচ্চা। ও খাট থেকে নেমে দেয়ালের আয়নার সামনে দাঁড়ায়। দেখতে পায় ওর মুখটা বিকট হয়ে যাচ্ছে ওর হাত ঊর্ধ্বমুখী। জিহ্বা একটা ডিমের খোলস এর মতো। ও চেঁচিয়ে ওঠে, বিশ্ববিদ্যালয় এমন কতগুলো মাকড়সা ছড়িয়ে দিয়েছে এই শহরে। এরা এখন খাদ্যের অন্বেষনে ব্যস্ত। এরা জানে না কে এদের পিতা। কার ঔরসে ওদের এমন জন্মের পরিহাস। একটু থেমে বিড় বিড়িয়ে বল, আমি পিতা হতে চাই। এই বেশ্যা সমাজের গায়ে থুতু দেবার জন্য আমি বেশ্যার গর্ভে একটি সন্তান জন্মাতে চাই।" [১৮]

এভাবে মেটাফরের সাংকেতিক ব্যবহারে সাহিত্যের মধ্যবিত্তিয় প্রশ্রয়পুষ্ট আত্মপ্রতারক প্রতিবেদনের ভাষাকে অন্তর্ঘাত করে গল্পকার সেলিনা হোসেন স্খলিত সময়ের ভাষাবীজ্ নির্মাণ করেন। যেখানে শুধুমাত্র প্রতারণা অবসাদের কৃষ্ণবিবরের নির্মিতিই মুখ্য সেখানে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার কুহক সুর আঁধারে হারিয়ে গিয়ে যে হাসেম মিয়ার আবছা ছায়া স্পষ্ট হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। আখ্যান এগিয়ে চলে। হাসেম মিয়ারা স্বপ্নের কুহক তৈরি করতে পারে হয়তো কিন্তু সম্ভাব্য স্বপ্ন-সৌধকে বাস্তবায়িত করতে পারেনা। তাই তার আমদানি করা ফালানী ওরফে মহুয়া শুধু ব্যর্থতার পশরা সাজিয়ে নিষ্ফলা সমাজ তথা দেশের মতোই মিজানের চোখের সামনে মিথ্যে আয়োজনে ন্যস্ত হয়। কিন্তু এই শোষক সমাজ তার উর্বরতা শক্তিকে শুষে নিয়েছে, সে ফসল ফলাতে পারে না। 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়' সর্বহারা ফালানীর নিশ্চেষ্ট শরীরের সঙ্গেই মিজানের স্বপ্নের জগৎ অবসিত হয়। 'সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয়।' (স্বপ্নের হাতে, জীবনানন্দ দাশ)

> "মিজানের চোখের সামনে একটি অনুর্বর শহর প্রবল হয়ে ওঠে। ওর মুখ ভরে থুতু আসে। ... এই পতিত জমির অন্ধকার ছেড়ে ও কোথায় পালাবে?" [১৯]

এখানে বন্ধ্যা ফালানী আর উত্তর-প্রজন্মের কাছে উদ্ভাসনহীন ভূখন্ডটি সমান্তরাল তাৎপর্যে উঠে আসে গল্পকারের অনবদ্য শৈল্পিক প্রয়োগে। মিজানরা হয়ে ওঠে আজন্ম সেই ব্যর্থতার দায় বহন করে চলা ফেরিওয়ালা।

এভাবেই গল্পকারের মননশীল সৃজন চর্চায় মানব জীবনের বিচিত্র আলো-আঁধারি নিরন্তর আভাসিত হয়ে চলে। তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় এক বিশেষ দায়িত্ব পালনের সততা এবং দৃঢ়তা নিয়েই যেন তাঁর সচেতন নির্মাণের জগত এগিয়ে চলে। তাই তাঁর প্রতিটি সংলাপ রচনা, শব্দ চয়ন, ভাষার ব্যবহার পাঠকের কাছে তাৎপর্যের নতুন ইশারাকে পৌঁছে দেয়। তাই পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান সময়ের নিরিখে সেলিনা হোসেনের গল্পবিশ্ব সাহিত্যিকের শিল্প সংকটের সমাধানকল্পে নিহিত অর্থের স্বাধীন সত্তাকে আবিষ্কার করে চলে যেন।

তথ্যসূত্র

১. সাক্ষাৎকার, 'শব্দঘর', সেলিনা হোসেন সংখ্যা, ৭ম বর্ষ, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৩৫
২. সাক্ষাৎকার, 'গল্পকথা', সেলিনা হোসেন সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, রাজশাহী, ২০১৫, পৃ. ১৯
৩. সাক্ষাৎকার, 'অগ্রবীজ', নারীর সাহিত্য ও সাহিত্যের নারী, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৯, পৃ. ৪৫
৪. ভট্টাচার্য তপোধীর, 'নারীচেতনাবাদ মননে ও সাহিত্যে', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪০-৪১
৫. হোসেন সেলিনা, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৮১
৬. তদেব, পৃ. ২৭৭
৭. তদেব, পৃ. ২৮৬
৮. তদেব, পৃ. ২৮৭
৯. তদেব, পৃ. ২৮৬-২৮৭
১০.সাক্ষাৎকার, 'গল্পকথা', সেলিনা হোসেন সংখ্যা, বর্ষ ৫ সংখ্যা ৬, রাজশাহী,২০১৫, পৃ. ২৬
১১.প্রাগুক্ত, 'পঞ্চাশটি গল্প', পৃ. ৩২৪
১২. Spender Dale, 'Man Made Language', 2nd edition, Routledge &Kegan Paul, London,1985, p. 106
১৩. প্রাগুক্ত, 'পঞ্চাশটি গল্প', পৃ. ৩১৫
১৪. প্রাগুক্ত, 'Man Made Language', p. 59
১৫. প্রাগুক্ত, 'পঞ্চাশটি গল্প', পৃ. ৩২৮
১৬. হোসেন সোহারাব, 'বাংলা ছোটগল্পে বাস্তবতাবোধের বিবর্তন', বুক্ স্পেস, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৬১
১৭. প্রাগুক্ত, 'পঞ্চাশটি গল্প', পৃ. ১৬৫
১৮. তদেব, পৃ. ১৬৬
১৯. তদেব, পৃ. ১৭১